মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী-বৈষম্যের চোরাপথ

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী
অধ্যক্ষ,
শহীদ নুরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়,
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ।

মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল – মানুষ নিজে ভাবতে পারে, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের অনুভূতি আছে, কারণে-অকারণে কোনো জিনিস তাঁর ভালো লাগতে পারে বা খারাপ লাগতে পারে; কিন্তু যন্ত্রের সেসব বালাই নেই। যন্ত্র নিজে ভাবতে পারে না, তার নিজের পছন্দ বা অপছন্দ বলে কিছু নেই, অনুভূতি - যন্ত্রের নেই। তাই, কোনো কিছুকে ভালো লাগা বা খারাপ লাগা – যন্ত্রের শব্দকোষে নেই। যন্ত্র কাজ করে শুধু কার্য-কারণ দ্বারা রচিত যুক্তির ভিত্তিতে। অন্যদিকে মানুষ যেহেতু তার জন্ম থেকে পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন আদান-প্রদানের ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে রচিত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয় – তাই তাঁর প্রতিটি কাজকর্মই নিজস্ব ভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, ভালো বা খারাপ লাগার মতো সূক্ষ্ম **মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়। মানুষের কাজ-কর্মে যে কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে** যুক্তিবাদীতা একেবারেই থাকে না – এমন নয়; তবে মানুষের যুক্তিবাদীতাকে বিভিন্ন মাত্রায় নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করে ব্যক্তির নিজস্ব মনোভাবজনিত পছন্দ-অপছন্দ, ভালো বা খারাপ লাগা। মোট কথা হল, যে কাজগুলিতে মানুষের নিজের মতামত খাটানোর সুযোগ আছে, সেসব কাজের ফলাফল কখনই সম্পূর্ণরূপে বস্তুনির্ভর (অর্থাৎ, objective বা মানুষরূপী কর্তার ব্যক্তিগত প্রভাব নিরপেক্ষ) হবে না। এক্ষেত্রে কর্তার কাছে "কাজটি কী? - এই প্রশ্নের পাশাপাশি আর একটি প্রশ্নও প্রকট হয়ে ওঠে যে, "কাজটি কার?"। এরূপ একটি কাজ হল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরীক্ষার উত্তরপত্রের মূল্যায়ন বা নম্বর দেওয়ার কাজ। পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর নাম জানতে পারেন – তা থেকে তিনি তার জাত, ধর্ম ও লিঙ্গও জানতে পারলেন। এবার কোনো কোনো পরীক্ষকের কোনো বিশেষ জাত /ধর্ম /লিঙ্গের প্রতি বিরূপ মানসিকতা বা অপছন্দ থাকা, বিশেষ করে আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে, একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার নয়। আর তা হলে, সেই বেচারা পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রে সেই পরীক্ষকের দ্বারা **প্রদেয় নম্বরে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য – সেকথা বলাই বাহুল্য! বিশেষ করে রচনাধর্মী বা** আলোচনা /ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্নের উত্তরগুলিতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত ফলানোর অবকাশ বেশি থাকে। এরূপ উত্তর দেখার সময় "উত্তরটি সঠিক কী না?" – সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে উত্তরটি লিখেছেন সেই ব্যক্তি (পরীক্ষার্থী) যে জাত /ধর্ম /লিঙ্গ সম্প্রদায়ের সদস্য – সেই সম্প্রদায়টি পরীক্ষকের মানসিক গঠনের বিশেষ ফ্রেমে "সঠিক" কী না? যেহেতু, আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমস্ত স্তরেই রচনাধর্মী বা আলোচনা /ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন, প্রশ্নপত্রের একটা বড়ো অংশ জুরে থাকে, তাই, আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরই পরীক্ষকের ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে – যদি পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম জানতে পারেন।

তবে হ্যাঁ, যন্ত্রের যেহেতু ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুভূতি নেই – তাই, যন্ত্রের (কম্পিউটার) দ্বারা পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন (নম্বর দেওয়া) করানো হলে যন্ত্রকে পরীক্ষার্থীর নাম বললেও অসুবিধা নেই। কিন্তু, আমাদের দেশে এখনও রক্ত-মাংসের মানুষই পরীক্ষার খাতার মূল্যায়ন করেন, যে মানুষের নিত্যান্ত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের অনুভূতি আছে, কাউকে (কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাত, লিঙ্গ, সংস্কৃতি, ভৌগলিক অঞ্চল, ইত্যাদিকে) ভালো বা খারাপ লাগার বিশেষ মানসিক গঠন আছে। তাই, নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে চাইলে, পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষার্থীর নাম প্রকাশ করা কোনো মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিন্তু পরীক্ষার্থী-বৈষম্যের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের-এর সমস্ত পরীক্ষায়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ড-এর পরীক্ষায়; সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে CBSE ও ICSE পরীক্ষাতেও পরীক্ষক কোনোভাবেই পরীক্ষার্থীর নাম জানতে পারেন না। CBSE ও ICSE পরীক্ষায় উত্তরপত্রের উপরের পাতাটি মাঝখানে উল্লম্বভাবে ... (ডট্) লাইন দিয়ে সমান দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। এর দুই ভাগেই পরীক্ষার্থীকে রেজিঃ নং. ও রোল নং. লিখতে হয় কিন্তু পরীক্ষার্থীর নাম শুধু ডান দিকের অংশেই লিখতে হয়, বাম দিকের অংশে নয়। পরীক্ষকের কাছে উত্তরপত্র পাঠানোর আগে নাম সহ অংশটি ছিড়ে রেখে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, CBSE ও ICSE পরীক্ষাতেও পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম জানতে পারেন না। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (WBBSE) এবং পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE)-এর পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রে নাম লিখতে হয় এবং পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর নাম সহ উত্তরপত্রগুলো পান! এর ফলে বহু পরীক্ষার্থীকে জাতগত, ধর্মগত, লিঙ্গগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়। বহু নিরপরাধ শিক্ষার্থী এরূপ বৈষম্যের শিকার হয়েছেন! যেটা ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারার সম্পর্ণ পরিপন্থী !

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের উপরেই শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিশা ঠিক হয়ে যায়! আর সেটা হয় খুব কম ২ বা ১ নম্বরের পার্থক্যের সীমানার মধ্যেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে জাত (Caste), ধর্ম (Religion) ও লিঙ্গের (Gender) ভিত্তিতে বৈষম্যকারী মানসিকতার লোকের অভাব নেই। শিক্ষকদেরও (পরীক্ষকদেরও) একটা অংশ যে এরূপ ক্ষতিকারক মানসিকতা থেকে মুক্ত নয় – তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, এহেন পরীক্ষকের কাছে এরূপ কোনো হতভাগা পরীক্ষার্থীর নাম যদি প্রকাশ পায়, যে নাম থেকে অনিবার্যভাবেই প্রকাশিত জাত /ধর্ম /লিঙ্গ সেই পরীক্ষকের যদি পছন্দ না হয় – তাহলে সেই নিরপরাধ পরীক্ষার্থীকে সেই বৈষম্যকারী পরীক্ষকের অপছন্দের বড়ো খেসারত দিতে হয়! জাত, ধর্ম ও লিঙ্গজাত বৈষম্যের ফলে প্রধানত সমাজের দুর্বল অংশের (এসসি, এসটি, ওবিসি, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু ও মহিলারা) মানুষরাই ক্ষতিগ্রস্থ হন। শিক্ষাই হল এই দুর্বলদের উত্তরণের একমাত্র সোপান। আর শিক্ষা অর্জনের প্রচেষ্টাতেই যদি তাদের প্রতি এরূপ অসাংবিধানিক বৈষম্য করা হয় – তাহলে তাঁদের বাঁচাবে কে? সেই জন্যই সরকার এই দুর্বলদের শিক্ষা অর্জনকে উৎসাহিত করতে একাধিক প্রকল্প ও প্রচেষ্টা জারি রেখেছেন। কিন্তু, মধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজিরবিহিনভাবে পরীক্ষার্থীদের নাম প্রকাশের মাধ্যমে সরকারের সকল সাধু উদ্দেশ্যকেই প্রকারান্তরে নস্যাৎ করা হচ্ছে!

শিক্ষাগত পারদর্শিতা পরিমাপের জন্য পরীক্ষার (Examination) বা অভিক্ষার (Test) যথার্থতা (Validity) ও বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability) যে দুটি মূল ভিত্তির উপরে দাড়িয়ে রয়েছে তা হল – পরীক্ষা পদ্ধতির গোপনীয়তা (Confidentiality) ও নিরপেক্ষতা (Biaslessness)। কিন্তু, বলার অপেক্ষা রাখে না

যে, পরীক্ষার্থীর নাম (তাই – জাত, ধর্ম, লিঙ্গ) পরীক্ষকের কাছে প্রকাশের দ্বারা পরীক্ষার না থাকছে গোপনীয়তা, না নিরপেক্ষতা! ফলস্বরূপ, পরীক্ষা তার জনমানসে যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে! যেমনটি, আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে হয়েছে! অন্য দিকে জাত, ধর্ম, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের ফলে প্রকৃত মেধাবীরা স্বীকৃতি পায় না, পায় মেকি বা বানানো নকল "মেধাবীরা"! এই নকলদেরকে মুকুট পরিয়ে দেশ ও সমাজ যখন আগাতে চায়, ভরসা করতে চায় – ফল হয় ভয়ঙ্কর! অন্যদিকে, আসল মেধা - স্বীকৃতি ও পরিচর্যার অভাবে ততদিনে নষ্ট হয়ে যায়! দেশ বড়ো ক্ষতির সম্মুখিন হয়, দিশাহীন হয়ে পরে!

উপরোক্ত মারাত্মক ক্ষতিকারক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, কর্তৃপক্ষের উচিত দেশ ও জাতির বৃহৎ স্বার্থে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর নাম পরীক্ষকের কাছে জ্ঞাত করার বর্তমান ভুল পদ্ধতির আসু অবসান ঘটানো যাতে পরীক্ষাদুটি রাজ্যের অন্যান্য পরীক্ষাগুলির ও সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষাগুলির তুল্যমূল্য হতে পারে এবং প্রকৃত মেধাকে ঠিক ঠিক পরিমাপ করতে পারে। এইভাবে পরীক্ষাদুটির গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা পাবে এবং জনমানসে সেগুলি নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগতাও ফিরে পাবে।